আহ্বান

আধুনিক মননে আলোর পরশ

মিজানুর রহমান আজহারি

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

কাছে আসার গল্প	১১
হেলদি লাইফস্টাইল	৩৭
দেহাবরণ	৬২
স্বপ্নকথা	৯৮
দীপ্তিময় তারুণ্য	১২৫
আল্লাহর চাদর	১৭৭
সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানারস	২০৬
শেষ ভরসা	২২৪

কাছে আসার গল্প

কখনো কি বিজন অন্ধকারে রবের পানে মুখ তুলে বলেছেন—'দয়াময় প্রভু! প্রাণাধিক ভালোবেসেছি তোমায়!'

ঝলমলে জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মেখে কখনো কি খুঁজেছেন রহমতের সুধা? অনুভব করেছেন কি কদর রাতে শান্তির সমীরণ? ভেবে দেখেছেন কি—এই যে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রকম্পিত হচ্ছে, ধমনিতে রক্ত বইছে আপন ধারায়, নিয়ম মেনে সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে মস্তিষ্কের অসংখ্য সূক্ষ্ম নিউরন, আপনার প্রতিটি স্পর্শ কিংবা উপলব্ধি—সবই মহান রবের অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ! আপনার সামগ্রিক অস্তিত্বই মহান রবের অনিঃশেষ রহমত ও ভালোবাসার জ্যোতির্ময় নিদর্শন!

তিনি তো সেই রব, যিনি আমাদের ক্ষমা করার জন্য মুখিয়ে থাকেন; অথচ কী নির্বোধ আর হতভাগা আমরা! মহান রবের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনার ফুরসতই পাই না। লাগাতার লিপ্ত থাকি নানাবিধ পাপাচারে। এতৎসত্ত্বেও তিনি আমাদের অক্সিজেন বন্ধ করে দেন না। এমনকী বন্ধ কামরায় নিভৃতে যখন গুনাহ ও নাফরমানিতে লিপ্ত হই, তখনও দরজার ফাঁক গলে অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন তিনি। আমরা তাঁকে ভুলে থাকি হররোজ, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও তিনি ভুলেন না আমাদের। আমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও তিনি পরম মমতায় কাছে ডেকে বলেন—'আমার দিকে এক পা এগিয়ে এসো, তোমার দিকে দুই পা এগিয়ে যাব আমি।' শেষ রাতের নিস্তব্ধতায় শান্ত-নিবিড় আবহে যে মহান প্রভু বান্দার দিকে স্নেহের বাহু বাড়িয়ে আহ্বান করেন—'কে আছ এমন, আমার কাছে চাইবে? আমি তোমায় সব দিয়ে দেবো!' সেই রব থেকে আমরা কতই-না বিমুখ! তাঁর ক্ষমার স্বরূপ এমনই যে, আমরা অনুতাপ বা অনুশোচনায় বিলম্ব করি; কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে বিলম্ব করেন না।

কত আদরে-যতনে আমাদের তৈরি করেছেন আল্লাহ! ধুলোবালি থেকে নিরাপদ রাখতে চোখের ওপর দিয়েছেন স্বয়ংক্রিয় পর্দা, ত্বককে করেছেন মসৃণ। অতিরিক্ত আলোয় যেন কষ্ট না পাই, সেজন্য চোখের ওপর দুই ভ্রু দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। নাকে যেন ধুলো না ঢোকে, সেজন্য তার ভেতরে নেটের ব্যবস্থা করেছেন ছোটো ছোটো লোম দিয়ে। পায়ের পাতা পুরু করেছেন, যেন পথ চলতে কষ্ট না হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানোর জন্য রিজিক হিসেবে পৃথিবীতে দিয়েছেন অসংখ্য নিয়ামত। গাছপালা, তরুলতা দিয়ে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেছেন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চলমান রাখার জন্য। সৌন্দর্যে চোখ জুড়ানোর জন্য প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন ফুলে-ফুলে। তাতে মোহনীয় সুবাসের গন্ধ দিয়েছেন। মিষ্টতায় হৃদয় ভরিয়ে দিতে রেণুর মাঝে সৃষ্টি করেছেন মধুর বিন্দু।

ফুলের মিলনমেলায় পাঠিয়েছেন রসিক ভ্রমর। অপরূপ দৃশ্যে ভরিয়ে তুলেছেন চারপাশ, যেন সতেজ হৃদয়ে ওঠে 'আলহামদুলিল্লাহ' গুঞ্জন, জাগরিত হয় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি।

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য আমাদের! যে রব সদা কাছে টানতে আগ্রহী, আমরা তাঁর থেকেই দূরে পালিয়ে বেড়াই অহর্নিশ। যিনি আমাদের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, আমরা তাঁর থেকেই মুখ ফিরিয়ে রাখি। শুধু তা-ই নয়; অজ্ঞতা, অবাধ্যতা, হঠকারিতা আর অহংকারের মাধ্যমে চোখের সামনে এমন এক দুর্ভেদ্য পর্দা তৈরি করে ফেলি, যা আল্লাহর নৈকট্যকেই আড়াল করে ফেলে। একপর্যায়ে ভুলেই যাই মহামহিম রবকে; ভুলে যাই সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার অনস্বীকার্য সম্পর্ক। কখনো কখনো স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসি অথবা তাঁর সমতুল্য ভাবা শুরু করি অন্য কাউকে। এতে অবাধ্যতার পর্দা কেবল পুরুই হতে থাকে। ফলে স্রষ্টার আহ্বান আর আমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। বিচ্ছিন্ন হয় রবের সঙ্গে বান্দার নিবিড় যোগাযোগ।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বান্দার চূড়ান্ত সফলতা। আর রবের নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রথমেই তাঁর অবাধ্যতা থেকে সরে আসতে হবে। একই সঙ্গে বিরত থাকতে হবে সমস্ত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে। তাঁর বিধানসমূহ পালনে হতে হবে অধিকতর যত্নশীল। অতঃপর আনুগত্যের শির নত করে আল্লাহ ও আমাদের মধ্যকার কৃত্রিম পর্দাকে ভেদ করতে হবে। অনুশোচনা ও ইস্তেগফার মেশানো চোখের পানি সেচে এগিয়ে নিতে হবে নৈকট্যের তরণি।

রবের নৈকট্যলাভের পথ

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সফলকাম ব্যক্তিরাই হবেন বিচার দিনে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের অভিহিত করেছেন সাবিকুন বা অগ্রগামী বলে। তিনি বলেন—

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ- اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ-

'আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামী-ই। তারাই নৈকট্যলাভকারী।' (সূরা ওয়াকিয়া : ১০-১১)

হাশরের মাঠে যখন মানুষ 'ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি' বলে বিলাপ করতে থাকবে, নিজের আমলনামা দেখে কঠিন পরিণামের ভয়ে বুক চাপড়াবে, পিপাসায় কাতর হয়ে আর্তচিৎকার দেবে পানি পানি বলে, তখন এই সাবিকুন তথা অগ্রগামীরা থাকবেন পরম নিশ্চিন্তে আরশের ছায়াতলে। তাঁদের জন্য প্রস্তুত থাকবে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত, যেখানে তারা মণিমুক্তা খচিত আসনে হেলান দিয়ে বসবেন। সামনে উপবিষ্ট থাকবে ডাগর ডাগর চোখের অধিকারী অপূর্ব মোহনীয় রূপসি হুর! যেন তারা লুকিয়ে রাখা কোনো দুষ্প্রাপ্য মুক্তো। আতিথেয়তার জন্য তাঁদের চারপাশে প্রজাপতির মতো বিচরণ করবে সুশ্রী বালকের দল! সেই স্নিগ্ধ পরিবেশে আকর্ষণীয় পাত্রে তাঁরা পরিবেশন করবে সুমিষ্ট শরাব; যাতে না থাকবে মত্ততা, না আসবে কোনো ঘোর!

হেলদি লাইফস্টাইল

সুস্থতা দুনিয়ার জীবনে সবচেয়ে বড়ো নিয়ামতগুলোর একটি। সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন জীবনে আনে ছন্দ, গতি আর প্রশান্তি। অন্যদিকে অসুস্থতা মানুষের সমস্ত অর্থবিত্ত, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে ম্লান করে দেয়। এজন্যই ইসলাম সুস্থতাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আল্লাহর নিকট একজন সুস্থ-সবল মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ও উত্তম।' (মুসলিম : ৬৯৪৫)

একজন সুস্থ-সবল মুমিন যথাযথ হকের সাথে আল্লাহর ইবাদত পালনে অধিক সমর্থ হন। পাশাপাশি মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন, পারেন অন্যের সাহায্যে পাশে দাঁড়াতে। প্রয়োজনে কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেও পিছপা হন না তিনি। তাই আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য হলেও নিজের সুস্থতা ও ফিটনেস সম্পর্কে মুমিনের সচেতন হওয়া একান্ত কর্তব্য। তা ছাড়া নিজের সুস্থতা ও ফিটনেসের প্রতি যত্নবান হওয়া মুমিনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও বটে। সকল নবি-রাসূলই সুস্বাস্থ্যের প্রতি ছিলেন যত্নবান। প্রত্যেকেই ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী কর্মবীর। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও অত্যন্ত কর্মঠ ও সক্রিয় জীবন নির্বাহ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মরুভূমিতে মেষ চড়াতেন, ব্যাবসা-বাণিজ্য করতেন দূর-দূরান্তে। নবুয়তের পূর্বে নিভৃতে ধ্যান করার উদ্দেশ্যে হাইকিং করে উঠেছেন ৬৩৪ মিটার উঁচু জাবালে নুর পর্বতের গুহায়। বাস্তব জীবনে উট, গাধা, ঘোড়া ইত্যাদি বাহনে চড়েছেন। নিজেই যুদ্ধপরিচালনা করেছেন, সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন জিহাদের ময়দানে। এ ছাড়া তিনি প্রায়ই মদিনার বাজার পরিদর্শনে যেতেন, অসুস্থদের দেখতে যেতেন, নিয়মিত মদিনা থেকে হেঁটে হেঁটে চলে যেতেন কুবা পর্যন্ত। ছাগলের দুধ দোহন থেকে শুরু করে নিজের জুতা-জামা সেলাই পর্যন্ত যাবতীয় সাংসারিক কাজে তিনি সাগ্রহে অংশ নিতেন। সর্বোপরি একটি কর্মচঞ্চল, গতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ।

সুস্থতা একদিনে অর্জিত হয় না। এটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিলে তিলে অর্জিত হওয়ার বিষয়। এর জন্য চাই পরিকল্পিত উপায়ে নিয়মিত শরীর, মন ও আত্মার পরিচর্যা এবং নিয়মমাফিক

জীবনযাপন। কিন্তু মানুষমাত্রই নিয়মের প্রতি উদাসীন। তারা যাচ্ছেতাই চলতেই অধিক পছন্দ করে। এ কারণে অজান্তেই মানুষ ধীরে ধীরে নিজের সুস্থতাকে দুর্ভেদ্য খাঁচায় বন্দি করে ফেলে। পরে যখন অসুস্থতা তার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়, তখন বুঝতে পারে—কী নিয়ামতকে এতদিন উপেক্ষা করেছে তারা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবি ﷺ ইরশাদ করেছেন—

> ‘অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তায়ালার দুটি বিশেষ নিয়ামতের প্রতি উদাসীন। একটি স্বাস্থ্য, অপরটি তার অবসর।’ (বুখারি : ৬৪১২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থতার জন্য একই সঙ্গে শরীর ও আত্মাকেও সমান গুরুত্ব দিতেন। এ দুইয়ের মাঝে সমন্বয়ের জন্য তিনি অনুসরণ করতেন নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি। পরিমিত ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, নিয়মিত ঘুম, শারীরিক শ্রম, বিনোদন, পরিবার ও আত্মীয়দের সময় দান, ইবাদত, জিকির, রোজা, দীর্ঘক্ষণ নামাজে মগ্ন থাকা ইত্যাদি ছিল তাঁর সুস্থ ও সাবলীল জীবনের প্রধান নিয়ামক। মনুষ্য বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কখনো অসুস্থ হলে তিনি যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ করতে কখনোই দ্বিধা করতেন না। বলতেন—

> ‘হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কেননা, মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার প্রতিষেধক তিনি দেননি। তবে একটি রোগ আছে, যার কোনো প্রতিষেধক নেই। আর তা হলো—বার্ধক্য।’ (ইবনে মাজাহ : ৩৪৩৬)

এবারে রাসূল ﷺ-এর সুস্বাস্থ্যের কয়েকটি চাবিকাঠি একটু জেনে নেওয়া যাক—

১. উত্তম খাদ্যাভ্যাস (Healthy Diet)

রাসূল ﷺ-এর সুস্বাস্থ্যের পেছনে সবচেয়ে বড়ো নিয়ামক ছিল উত্তম খাদ্যাভ্যাস। তিনি ছিলেন পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। কখনো উদর পূর্তি করে খেতেন না। পেটকে আনুমানিক তিন ভাগ করে এক ভাগের জন্য খাবার খেতেন, আরেক ভাগ পানি দ্বারা পূর্ণ এবং অপরভাগ খালি রাখতেন সব সময়।

রাসূল ﷺ অল্পই খেতেন, কিন্তু তা খেতেন উপভোগ করে। খাবার নষ্ট করতেন না কখনো। বড়ো থালা ব্যবহার করতেন, যেন খাবার মাটিতে না পড়ে। কোনো কারণে খাবার পড়ে গেলে তা পরিচ্ছন্ন অবস্থায় তুলে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করতেন চামড়ার দস্তরখান। থালায় কোনো খাবার ফেলে রাখতেন না; এমনকী আঙুলে লেগে থাকা খাবারের অবশিষ্ট অংশও চেটে খেতেন। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন—

> ‘নবিজি খাবার খেলে তাঁর তিন আঙুল চেটে খেতেন। আর বলতেন—“তোমাদের কারও নলা পড়ে গেলে সে যেন তা শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে; বরং ধুয়ে খেয়ে ফেলে।

আর চেটে খায় যেন থালাটিও। কারণ, তোমরা তো জানো না, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।”’ (মুসিলম : ৬০৮)

খাবার শেষে আঙুল চেটে খাওয়ার সুন্নত থেকে চিকিৎসাবিদগণ একটি চমৎকার তথ্য বের করেছেন। এ সময় মুখের ভেতর সেলিভারি গ্ল্যান্ড (Salivary Gland) থেকে টায়ালিন (Ptyalin) নামক একপ্রকার পাচক রস বের হয়। পাকস্থলী থেকে শিষণ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই এটি প্রায় সব খাবার অর্ধেক হজম করে ফেলে।

রাসূল ﷺ খুবই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার গ্রহণ করতেন। খাওয়ার পূর্বে দুই হাতের কবজি পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন। সর্বদা খাবার গ্রহণ করতেন ডান হাত দিয়ে। কারণ, ডান হাত বাম হাত অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ও উত্তম। তা ছাড়া ডান হাতে খাওয়া রুচিসম্মতও বটে। তিনি খাবারে কখনো ফুঁ দিতেন না। এটা ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও খাবারে ফুঁ দিতে নিষেধ করে। কারণ, ফুঁ দিলে মুখ থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড খাবারে মিশে যায়, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কোনো কিছুর ওপর হেলান দিয়ে খাবার খেতে তিনি নিষেধ করেছেন। হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণের ফলে পেট বড়ো হয়ে যায়। এতে খাবার গলায় আটকে যেতে পারে অথবা শ্বাসনালিতে ঢুকে যেতে পারে। তা ছাড়া এটা দাম্ভিকতার আলামতও বটে। আবু হুজাইফা (রা.) বর্ণনা করেন—

‘আমি রাসূল ﷺ-এর দরবারে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন—“আমি ঠেস লাগানো অবস্থায় কোনো কিছু ভক্ষণ করি না।”’ (বুখারি : ৫১৯০, তিরমিজি : ১৯৮৬)

নবি করিম ﷺ বালিশে বিশ্রাম নেওয়া অবস্থায়ও কখনো খাবার খেতেন না। তিনি তিন আঙুল দিয়ে খাবার উঠিয়ে ছোটো ছোটো লোকমায় খাবার খেতেন। একদমই তাড়াহুড়ো করতেন না। এতে ভালো করে চিবিয়ে খাওয়ার সুযোগ পেতেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে—উত্তমরূপে চিবিয়ে খেলে খাবার ভালোভাবে চূর্ণ হয়। ফলে খাবারের যাবতীয় পুষ্টি শরীর সহজেই শোষণ করতে পারে। তা ছাড়া চিবিয়ে খেলে খাবার অপেক্ষাকৃত বেশি সময় মুখে থাকে। এতে খাবারের মধ্যকার স্নেহ ও চর্বিজাতীয় পদার্থ দ্রুত হজম হওয়ার সুযোগ পায়। খাবার দীর্ঘক্ষণ চিবিয়ে খেলে মস্তিষ্ক অল্পতেই তৃপ্ত হয়। ফলে অতি ভোজনের সম্ভাবনাও কমে যায়।

দেহাবরণ

পরিবার মানুষের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনের মধ্য দিয়েই এর সূচনা। এই বন্ধন সুদৃঢ় হলে দাম্পত্য সম্পর্কে প্রবাহিত হয় প্রশান্তির নির্মল বাতাস, পরিবার পরিণত হয় শান্তির নীড়ে। অন্যদিকে এই বন্ধন ঢিলে হলে পুরো পরিবারই এলোমেলো হয়ে যায়। তাই দাম্পত্যজীবনকে প্রশান্তিদায়ক ও উপভোগ্য রাখার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছে ইসলাম। দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য ইসলাম এমন সব নীতিমালা উপহার দিয়েছে, যার পূর্ণ অনুসরণে স্বামী-স্ত্রী দুজনের সম্পর্ক হয়ে উঠবে গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ।

স্বামী-স্ত্রী একটি অঙ্কুরিত চারাগাছের জোড়া পল্লবের মতো; যার অস্তিত্ব ভিন্ন, কিন্তু মূল এক ও অভিন্ন। এই দুই কিশলয়ের ঘনিষ্ঠ যাত্রায় একদিন তা পরিণত হয় শত পল্লববিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষে। একসময় তার ঘন ছায়ায় আশ্রয় নেয় পরবর্তী প্রজন্মের খালিদ, উমর ও সুমাইয়ারা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

‘তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।’ (সূরা রূম : ২১)

--الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

‘তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া।’ (সূরা নিসা : ১)

মানবেতিহাসের প্রথম নারী হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল তাঁর স্বামী আদম (আ.)-এর পাঁজরের হাড় থেকে। অর্থাৎ, সৃষ্টিসূত্রেই তাঁরা একে অপরের দেহাংশ। এজন্যই স্ত্রীকে বলা হয়

অর্ধাঙ্গিনী, আর স্বামীকে অর্ধাঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে জীবনসঙ্গিনীকে ছাড়া একজন ব্যক্তির দ্বীনও অপূর্ণ থেকে যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন–

'বান্দা যখন বিবাহ করে, তখন সে নিজের অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে। অতএব, বাকি অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।' (আল জামিউস-সগির : ৬১৪৮)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এতটাই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ যে, এর উপমায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বলেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ--

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক।' (সূরা বাকারা : ১৮৬)

সুবহানাল্লাহ! এর চেয়ে সুন্দর ও যৌক্তিক উপমা আর কী হতে পারে! এটি শুধু স্বামী-স্ত্রীর সৌন্দর্যকেই প্রকাশ করে না; বরং তাদের অন্তরঙ্গতা, অপরিহার্যতা, গুরুত্ব, দায়িত্ব ইত্যাদিকেও ফুটিয়ে তোলে চমৎকারভাবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য ঠিক কেন পোশাকের মতোই অপরিহার্য অনুষঙ্গ, পোশাকের গুণাবলি ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলেই সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে–

সৌন্দর্যবর্ধনকারী : পোশাক মানুষের সৌন্দর্যবর্ধন করে, ব্যক্তির রুচিবোধ ও চারিত্রিক মর্যাদাকে ফুটিয়ে তোলে সকলের সামনে। একইভাবে যোগ্য দাম্পত্যসঙ্গী জীবনে এনে দিতে পারে বর্ণিল রঙের ছটা। ভালোবাসার আবিরে রাঙিয়ে দেয় হৃদয়ের জমিন। সঙ্গিনী যোগ্য, কর্মঠ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও পরহেজগার হলে অন্যের নিকট তার মর্যাদা বেড়ে যায় বহুগুণে। সঙ্গীর হৃদয়ে প্রবাহিত হয় সুখানুভূতির মৃদুমন্দ হাওয়া। আর মনের এই সৌন্দর্যই একসময় প্রতিফলিত হয় তার চিন্তা ও কর্মে।

নিকটতম বস্তু : পোশাক মানুষের সবচেয়ে কাছের বস্তু। সর্বদা শরীরের সাথে লেগে থাকায় দেহ আর পোশাকের মধ্যে কোনো আড়াল বা পর্দা অবশিষ্ট থাকে না। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, মানুষ চেষ্টা করে নিজেকে সর্বদা পোশাকের সাথে জড়িয়ে রাখতে। অসাবধানতায় পোশাক আপন জায়গা থেকে সরে গেলে তা ঠিক করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায়। আদর্শ স্বামী-স্ত্রীও অনুরূপ। তারা পরস্পরের সবচেয়ে নিকটজন। উভয়ের মাঝে নেই কোনো পর্দা, নেই কোনো ব্যবধান। শত বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে তারা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকে। বেখেয়ালে যদি কখনো দূরত্ব তৈরি হয়েই যায়, গোচর হওয়ামাত্রই সঙ্গীকে কাছে টেনে নেয় পরম আদরে। বেঁধে নেয় ভালোবাসার মিষ্টি-মধুর অনুরাগে।

দুর্বলতা আচ্ছাদনকারী : পোশাক মানুষের যাবতীয় অসুন্দর ও কুৎসিত রূপ ঢেকে রাখে। গোপন রাখে দৃশ্যমান সকল শারীরিক দুর্বলতা। নিশ্চিত করে লজ্জাস্থানের নিরাপত্তা। স্বামী-স্ত্রীর জন্যও

অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারা পরস্পরের যাবতীয় গোপনীয়তাকে রক্ষা করবে। দোষত্রুটি ঢেকে রাখবে। সঙ্গীর রূপ-সৌন্দর্য অপরের নিকট বলে বেড়ানো থেকে বিরত রাখবে নিজেকে। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা জঘন্য অপরাধ। রাসূল ﷺ বলেন–

'কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়ো খেয়ানতকারী ও নিকৃষ্টতম বিবেচিত হবে ওই ব্যক্তি, যে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর স্ত্রীর গোপনীয়তা অন্যের নিকট ফাঁস করে দেয়।' (মুসলিম : ১৪৩৭)

আদর্শ যুগল আপন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর চারিত্রিক দুর্বলতাকে গোপন রাখবে এবং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে তা শুধরে ফেলার। একই সঙ্গে বৈধ উপায়ে একে অন্যের যাবতীয় চাহিদা মিটিয়ে লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখবে সকল প্রকার পাপাচার থেকে।

ক্ষতিকর বস্তু থেকে হেফাজতকারী : পোশাক মানুষকে বাইরের বিভিন্ন ক্ষতিকর বস্তু থেকে রক্ষা করে। দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখে ধুলো-বালি-ময়লা থেকে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় উষ্ণতা দেয়, প্রখর খরতাপে দেয় সুরক্ষা। একইভাবে স্বামী-স্ত্রীও আপন সঙ্গীকে চোখের পাপ থেকে হেফাজতে রাখে। নফসের লাগাম টেনে দমন করে কুপ্রবৃত্তির অদম্য চাহিদা।

ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক : পোশাক অনেক সময় ব্যক্তির জাতীয় ও পেশাগত পরিচয় বহন করে। পোশাকের ধরন দেখলেই টের পাওয়া যায়, ব্যক্তি কোন পেশা ও ধর্মকে ধারণ করে। যেমন : ইউনিফর্ম দেখলেই বোঝা যায়—ব্যক্তি ডাক্তার, আইনজীবী, পুলিশ নাকি আলিম। পোশাক ব্যক্তির পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কে অন্যের নিকট সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেয়। দম্পতি যুগলের অবস্থাও অনুরূপ। তারা পরস্পরের পরিচয় ও ইজ্জতের প্রতিনিধিত্ব করে। স্ত্রীর নেতিবাচক গুণ বা আচরণের কারণে স্বামীর সম্মানহানি হয়; আবার স্বামীর মন্দ কর্মকাণ্ড আঁচড় ফেলে স্ত্রীর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বে। অনুরূপ একজনের মহৎ গুণ ও সাফল্যে দুজনেরই মুখ উজ্জ্বল হয়।

দীপ্তিময় তারুণ্য

তরুণরা হলো ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বর্তমান প্রতিচ্ছবি। তাদের হাত ধরেই নির্মিত হয় একটি নতুন পৃথিবীর পাটাতন। কোনো জাতির তরুণদের জীবনচরিত দেখেই অঙ্কন করা যায় সেই জাতির অনাগত দিনের চিত্র। তাই সমাজপতি ও সমাজকর্মী, বিশেষত যারা একটি সোনালি সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেন, তাদের নিকট তরুণ প্রজন্ম বরাবরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তারুণ্য বিনির্মাণের কাজ শুরু হয় শৈশব থেকেই। শৈশব ও কৈশোর হলো জীবন গঠনের প্রথম অধ্যায়। পূর্ণ বয়সে একজন মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা কেমন হবে, তা নির্ভর করে তরুণ বয়সের পরিচর্যার ওপর। তাই শৈশব ও কৈশোর থেকেই তরুণদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

তারুণ্য বিকাশে নববি কৌশল আমাদের জন্য সর্বোত্তম নকশা এবং সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। এজন্য নবি-রাসূলগণ তরুণ বয়সে কীভাবে নিজেদের নির্মাণ করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে অনুজ তরুণদের কীভাবে সোনালি মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন, তা জানা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কেননা, নবি-রাসূলগণের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতিই উপহার দিতে পারে একটি আলোকিত প্রজন্ম।

আদর্শ তরুণ প্রজন্ম গড়ে তুলতে অভিভাবক ও সমাজের জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু করণীয় রয়েছে। সমাজের প্রত্যেকের উচিত করণীয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিজ নিজ দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করা। এগুলো হলো—

উত্তম চরিত্রের উপমা উপস্থাপন

শিশু-কিশোররা প্রকৃতিগতভাবেই ভীষণ অনুকরণপ্রিয়। তারা কথা বা উপদেশের চেয়ে বড়োদের কর্মকে খেয়াল করে বেশি এবং বড়োদের কাজকেই মনে করে আদর্শ। ফলে নিজেরাও সেই কর্ম ও আচরণের অনুকরণ শুরু করে। প্রত্যেক শিশু-কিশোরই মনে করে—তার আশপাশের বড়োরা যা করেছে, তা-ই সঠিক। তাই একজন দাঈ ও সমাজের জ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো—শিশু-কিশোর ও তরুণদের সামনে নিজেকে উত্তম চরিত্রের উপমা হিসেবে উপস্থাপন করা। যাবতীয় অনর্থক ও বাজে কর্ম থেকে বিরত থাকা। তাদের সামনে এমন কথা না বলা, যার ফলে তাদের মনে বিরূপ প্রভাব পড়ে।

আমরা অনেক সময় হাসির ছলে মিথ্যা বলে ফেলি। শিশু-কিশোরদের মনে এসব ছোটো ছোটো বিচ্যুতিও গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে। আর অসৎ লেনদেন, মানুষ ঠকানো, বেইনসাফির মতো ঘৃণ্য অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকা তো একেবারেই অত্যাবশ্যক; বরং এসবের বিরুদ্ধে আমাদের শক্ত অবস্থান দেখানো উচিত। এতে শিশুরা তাদের জীবন প্রভাত থেকেই এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘৃণা করতে শিখবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে—যদি শিশু-কিশোরদের মধ্যে একটি স্বচ্ছ ও নির্মল জীবনবোধ ছড়িয়ে দেওয়া না যায় এবং তাদের অভ্যাসকে ছোটো থেকেই পরিচ্ছন্ন না রাখা যায়, তাহলে পরবর্তী সময়ে তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসাটা খুবই চ্যালেঞ্জিং।

হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃজন ও কৌতূহল নিবারণ

তরুণ মন সীমাহীন কৌতূহলে ভরপুর থাকে। এই কৌতূহলকে নিবারণে যারা এগিয়ে আসে, তাদের প্রতিই তরুণরা আকৃষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। তাই কিশোর মনের কৌতূহলকে কল্যাণকর উপাদান দিয়ে ভরিয়ে দিতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। অথচ আমাদের সমাজে সাধারণত দেখা যায়—তরুণদের সাথে বড়োরা বরাবরই দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। ছোটোরা কাছে ঘেঁষলেই চড়া গলায় বলে ওঠেন—'বড়োদের সামনে তোমাদের কী? এই বয়সে এত কিছু জেনে হবে কী? যাও পড়তে বসো গিয়ে!'

বড়োদের এমন আচরণে কিশোর-তরুণরা সমাজের বা পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং তাদের ভাবতে থাকে দূরবর্তী কেউ। ফলে নিজেদের যাবতীয় কৌতূহল মেটাতে তারা মিশে যায় দুষ্ট ও বখাটে ছেলেদের ভিড়ে। এতে তারা একটি ভালো কৌতূহলও নোংরা বা অশ্লীল বার্তা দ্বারা মেটায়। এই অসৎসঙ্গের ফলে জীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই ভুল তথ্য, অসৎ মনোবৃত্তি ও অশ্লীল কল্পনা নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে তারা। সময়ের আবর্তনে এই নেতিবাচক বিষয়গুলোই তাদের পুরো মন-মগজ ও স্বভাব-চরিত্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ধীরে ধীরে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ ব্যাপারগুলোই স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে তাদের কাছে। কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে, কেউ পর্নোগ্রাফিতে বুঁদ হয়ে থাকে, কেউ-বা জড়িয়ে পড়ে কিশোর গ্যাঙের সাথে। এভাবে অন্ধকার পথে শুরু হয় তাদের নীরব যাত্রা। আর মুকুলেই ঝরে পড়ে অপার সম্ভাবনাময় এক প্রজন্ম।

তরুণদের ধ্বংসাত্মক ভবিষ্যৎ থেকে রক্ষার জন্য পরিবার ও সমাজের জ্যেষ্ঠদের কর্তব্য হলো—শিশু-কিশোর ও তরুণদের কাছে টেনে নেওয়া, তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনা এবং তাদের যাবতীয় কৌতূহল উত্তম ও সঠিক তথ্য দ্বারা নিবারণ করা। এতে বাজে বন্ধুর পরিবর্তে পরিবার ও সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরই যোগ্য বন্ধু মনে করবে তারা।

মন ও মগজে তাওহিদের বীজ বপন

শিশু-কিশোরদের নিকট একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর পরিবার ও সমাজের অগ্রজদের কর্তব্য হলো—পরিস্থিতি বুঝে আস্তে আস্তে তাদের মন ও মগজে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের বীজ বপন করা। বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোকে কিশোর-তরুণদের শেখাতে হবে—তাওহিদ ও রিসালাতের গুরুত্ব কী? দুনিয়া ও আখিরাতে এর প্রভাবই-বা কতটুকু? দুনিয়া সৃষ্টি, এর ধ্বংস, মানব সৃষ্টির ইতিহাস ও উদ্দেশ্য, মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য ইত্যাদি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের ছোটো থেকেই সচেতন করে তোলা জরুরি।

শিশু-কিশোরদের বোঝাতে হবে—ঈমান-আখলাক ও নৈতিকতার গুরুত্ব কতটা গভীর! সাহাবিগণ ঈমান ও নৈতিকতার জন্য কীভাবে জীবনবাজি রেখেছেন; কিন্তু ঈমান ও নৈতিকতার প্রশ্নে আপস করেননি, তা তরুণদের মনে সুচারুভাবে এঁকে দিতে হবে। একজন তরুণ যখন জানবে তাকে কে সৃষ্টি করেছে, কেন সৃষ্টি করেছে, তার জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং গন্তব্য কোথায়; তখন সে নিজের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে আপনাআপনিই সচেতন হবে। সচেষ্ট হবে আদর্শ জীবন পরিগঠনে।

আদরের সাথে শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন আদব-কায়দা, নিয়ম-পদ্ধতি ও ঈমান-আখলাকের শিক্ষা দিতে হবে। শৈশবকালে একবার রাসূল ﷺ-এর কোলে বসে উমর ইবনে আবু সালামা (রা.) খাবার গ্রহণ করছিলেন। শিশু উমর থালার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এলোমেলোভাবে খাবার নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। এমন অস্থিরমতি ভাব দেখে নবিজি বললেন—'হে বৎস! বিসমিল্লাহ পড়ো। ডান হাতে খাও এবং তোমার ডান পাশ থেকে খাও।' রাসূল ﷺ-এর এই কোমল দিকনির্দেশনা তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। পরবর্তী সময়ে খাবার খেতে বসলে তিনি এ ব্যাপারটি খেয়াল রাখতেন।

ভালো-মন্দ বিচারের বোধ ও মনন তৈরি

ভালা-মন্দ বিচার করার মতো বোধ তৈরি হয় কিশোর বয়সেই। তাই এই বয়স থেকেই তাদের ভালো-মন্দ বুঝে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা কর্তব্য। কিশোররা কোনো ভুল করে বসলে অভিভাবকদের বলা উচিত— 'তুমি নিজেই বলো তো এটা ঠিক হয়েছে কি না! এমন কাজ কি তোমার সাথে যায়?' এভাবে ভালো-মন্দ বিচারের ভার যখন তার দিকেই অর্পণ করা হয়, তখন সে বুঝতে পারে—জ্যেষ্ঠরা তার থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করে, খারাপ বা অন্যায় কিছু করা তার শোভা পায় না। ফলে সে পরবর্তী সময়ে ভালো-মন্দ বিচার করে কাজ করার অভ্যন্তরীণ তাড়না অনুভব করে।